Vol. 47 | No. 2 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# জসীমউদ্‌দীনের গানে নারীর কণ্ঠস্বর

| | |
|---|---|
| Volume | 47 |
| Issue | 2 |
| Year | 2006 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Md. Abdus Sobhan Talukder |
| Published online | February 1, 2006 |
| DOI | 10.62328/sp.v47i2.5 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v47i2.5 |
| Pages | 86-108 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

# জসীমউদ্‌দীনের গানে নারীর কণ্ঠস্বর

মো: আবদুস সোবহান তালুকদার*

জসীমউদ্‌দীনের বহুমাত্রিক পরিচয়ের মধ্যে একটি পরিচয় হচ্ছে তিনি সংগীতজ্ঞ– একাধারে গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী এবং সমঝদার শ্রোতা। তাঁর সংগীত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কবিপ্রতিভার সূচনা পর্ব থেকেই। ১৯২৭ সালে জসীমউদ্‌দীনের প্রথম গ্রন্থ 'রাখালী' প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে আঠারোটি কবিতার পাশাপাশি সংকলিত হয় তাঁর পাঁচটি গান। এর আট বছর পরে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গানের বই 'রঙিলা নায়ের মাঝি'। এটি তাঁর ষষ্ঠ প্রকাশিত গ্রন্থ। কবির দ্বিতীয় গীতিসংকলন 'পদ্মাপার' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। 'গাঙের পার' কবির শেষ প্রকাশিত গানের বই। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সালে। এ ছাড়াও কবির সংগৃহীত জারী গানের একটি সংকলন ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় 'জারী গান' নামে। অনুরূপভাবে কবিসংগৃহীত মুর্শীদা গানের সংকলন 'মুর্শীদা গান' প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। 'রাখালী' কাব্যের পাঁচটি গানের কথা বাদ দিলে, জসীমউদ্‌দীনের গানের বই মোট পাঁচটি – 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'পদ্মাপার', 'গাঙের পার', 'জারী গান' এবং 'মুর্শীদা গান'। এ বইগুলোর ভেতর প্রথম তিনটির সঙ্গে শেষের দুটির একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রথম তিনটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে কবির স্বরচিত ও সংগৃহীত গান। সংগৃহীত গানগুলো আদ্যোপান্ত সংগৃহীত বা সংকলিত নয় – গানের প্রথম দুই বা চার লাইন সংগৃহীত, বাকি অংশে রয়েছে কবির স্বাধীন অনুসৃতি। প্রচলিত গ্রাম্যগানকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে কবি অনেক গানকেই পুনর্নির্মাণ করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এসব 'সংগৃহীত' গানকে সংগৃহীত না বলে জসীমউদ্‌দীনের গান বলাই শ্রেয়। তবে শেষের দুটি গ্রন্থ – 'জারী গান' ও 'মুর্শীদা গান' একান্তভাবেই কবির সংগৃহীত গান। এসব গান কবি যে আঙ্গিকে শুনেছেন, সেই বাণী অবিকৃতভাবে তিনি সংকলিত করেছেন গায়কের নাম-ধাম-বয়স-পেশা-ঠিকানা বিস্তৃত পরিচয়সহ। সুতরাং আমাদের বর্তমান আলোচনায় জসীমউদ্‌দীনের গান বলতে 'রাখালী', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'পদ্মাপার' ও 'গাঙের পার' গ্রন্থভুক্ত গীতিসংকলনকে বুঝবো।

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জসীমউদ্‌দীনের গানের সংখ্যা নিয়ে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী 'রঙিলা নায়ের মাঝি'তে সংকলিত গানের সংখ্যা মোট ৪৮ টি; এর ভেতর ৩৪ টি কবির নিজের লেখা, বাকি ১৪ টি সংগৃহীত গ্রাম্যগান; স্বরচিত ৩৪ টি গানের ভেতর ৪ টি ইতোপূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত, ৩০ টি নতুন সৃষ্টি।[১] কবির পারিবারিক প্রকাশন সংস্থা 'পলাশ প্রকাশনী' (১০, কবি জসীমউদ্‌দীন রোড, ঢাকা) থেকে প্রকাশিত রঙিলা নায়ের মাঝির দশম সংস্করণে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮) ৪৭ টি গান মুদ্রিত দেখা যায়। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় তথ্য দিয়েছেন : 'পদ্মাপারে' রয়েছে ৪২ টি গান এবং এই নামীয় একটি গীতিনাট্য।[২] অথচ পলাশ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'পদ্মাপার' (ষষ্ঠ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৬) গ্রন্থে দেখা যায় গীতিনাট্যটি ছাড়া রয়েছে ৫২ টি গান। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'জসীমউদ্‌দীন' গ্রন্থে জসীমউদ্‌দীনের গ্রন্থপঞ্জিতে 'গাঙের পার' গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলেও এ গ্রন্থের ওপর কোনো আলোচনা করেন নি। পলাশ প্রকাশনী প্রকাশিত 'ধানখেত' গ্রন্থ শেষে 'জসীমউদ্‌দীন : জীবনপঞ্জি' অংশে বলা হয়েছে :

> ১৯৫৪ : গাঙের পার গীতি সংকলন গ্রন্থটি পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুরাতন আটটি গান ও নতুন ষোলোটি গানের সমন্বয়ে মোট চল্লিশটি(!) গান এ গ্রন্থে সংকলিত হয়, যা পরবর্তীকালে সরকারের তথ্য বিভাগ থেকেও পুনর্মুদ্রিত হয়।[৩]

পলাশ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'গাঙের পার' (দ্বিতীয় প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৯৭) গ্রন্থে 'কোরবানীর জারী' শীর্ষক একটি দীর্ঘ জারী গান ছাড়া ১৫ টি কবিতা এবং একটি পুরাতন গান 'এবার ধান কাটিব কচাকচ' মুদ্রিত দেখা যায়। এ উদ্ভূত বিভ্রান্তিকর অবস্থায় জসীমউদ্‌দীনের গানের সংখ্যা নির্ণয় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জসীমউদ্‌দীনের গানের সংখ্যা নির্ণয়ে গবেষক-সমালোচকদের প্রদত্ত তথ্যকেই আমরা প্রামাণ্য মনে করছি। 'রাখালী' তে গানের সংখ্যা ৫। এই ৫ টি গানের ২ টি গান রঙিলা নায়ের মাঝিতে সংকলিত আছে। সুতরাং রঙিলা নায়ের মাঝিতে নতুন গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬ (৪৮-২=৪৬)। পদ্মাপারে গানের সংখ্যা ৪২, গাঙের পারে নতুন গানের সংখ্যা ১৬। সুতরাং, এই হিসেবে জসীমউদ্‌দীনের গানের সংখ্যা সর্বমোট ১০৯ টি।

জসীমউদ্‌দীনের গানগুলোকে নানা শ্রেণীতে সাজানো যায়। উল্লেখ্য, 'রঙিলা নায়ের মাঝি' ছাড়া আর কোনো গীতিসংকলনের গানকে কবি সংগীত শাস্ত্রের পরিভাষায় শ্রেণী বিন্যস্ত করেন নি। 'রঙিলা নায়ের মাঝি' তে বিচ্ছেদ গানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি (৮ টি) । এরপর যথাক্রমে ভাটিয়ালী (৭টি) এবং মুর্শীদা গান (৬টি)। বিচ্ছেদ, ভাটিয়ালী, মুর্শীদা গান ছাড়াও এ গ্রন্থে রয়েছে রাখালী ও বিচ্ছেদ মিশ্র, বিয়ের

গান, গাজীর গান, মুর্শীদা ভাটিয়াল, ভাওয়াইয়া, ভাওয়াইয়া ও রাখালী, মুর্শীদা ও রাখালী মিশ্র, বাউল,মাইজভাণ্ডারী ও ভাটিয়াল মিশ্র, বারমাসী, রাখালী, বিচ্ছেদ সারি মিশ্র গান প্রভৃতি। 'রাখালী' কাব্যের ৫ টি গানে কবি শুধু সুরের ধরন উল্লেখ করেছেন। কবিতার নাম এবং সুরের প্রকৃতি যথাক্রমে নিম্নরূপ : 'সিঁদুরের বেসাতি' (মেয়েলি গানের সুর), 'বৈদেশী বন্ধু' (বারমাসীর সুর), 'সুজন বন্ধুরে' (বন্ধের গানের সুর), 'মনই যদি নিবি' (ঘাটু গানের সুর), এবং 'গহীন গাঙ্গের নায়া' (ভাটিয়াল সুর)। 'পদ্মাপার' গ্রন্থের গানগুলোকে তিনি বিষয় অনুযায়ী যথাক্রমে 'পল্লীগীতি', 'ইসলামী গান', 'আধুনিক গান' এবং 'গ্রাম্য গান সংগ্রহ' এই চারটি বিভাগে বিভক্ত করে সাজিয়েছেন।

ভাটিয়ালীকে বলা হয়ে থাকে সব রকম লোকসংগীতের বুনিয়াদ।[৪] করুণাময় গোস্বামীর মতে বাংলাদেশের আঞ্চলিক সংগীতোদ্যোগের মধ্যে ভাটিয়ালী হলো সর্ব প্রধান ধারা।[৫] প্রকৃতপক্ষে ভাটিয়ালী বিশেষ এক ধরনের সংগীত নয়। বিষয়গত বিবেচনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব লোক গান আছে, তার মূল সুর ভাটিয়ালী। এটি মূলত সুরের নাম, গানের নাম নয়।[৬]

বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাটিয়ালীকে বলেছেন 'নিঃসঙ্গ অবসরের একক সংগীত'।[৭] ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে নদী, নৌকা, নৌকার মাঝি-মাল্লা এবং নদীর 'ভাইটাল' স্রোত। নদীমাতৃক পূর্ব বাংলা ভাটিয়ালীর জন্মস্থান।[৮] নদীমাতৃক বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদী। নদীপ্রধান এ দেশের মানুষ জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই নদীর বুকে নৌকা ভাসায়। ভাটি গাঙে নাও ভাসিয়ে মাঝিরা সাধারণত যে গান গাইত, তাকেই বলা হতো ভাটিয়ালী গান।[৯] ভাটি অঞ্চলের গান বলেই 'ভাটিয়ালী'[১০] —ভাটিয়ালীর এরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা হয়ে থাকে। মুহম্মদ এনামুল হক ভাটিয়ালীর উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন,

> সুদূরের পথে জলে ভাসতে ভাসতে মাঝিদের মনে জীবনের সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের বহু ছবি ভেসে ওঠে। ভাইটাল গাঙের কলধ্বনি যেন তাদের সুদূরের পিয়াসী মনের নিরুদ্দেশ যাত্রার সন্ধান দিতে থাকে। আর তারা নদীর সর্পিল গতির মতো দরাজ গলায় একটানা সুরে জীবনের সুখ-দুঃখের জাল বোনে। এমনি করেই 'ভাটিয়াল' শব্দ থেকে 'ভাইটাল' পরে ভাটিয়ালি কথার উৎপত্তি।[১১]

ভাটিয়ালি গানের মুখ্য বিষয় প্রেম। সাধারণ মানুষের বিরহ-বেদনা ও নৈরাশ্যই প্রাধান্য পেয়েছে এ গানে। পার্থিব প্রেমের গানে নর-নারীর আশাভঙ্গজনিত দুঃসহ বেদনার সুর এতে ধ্বনিত হয়েছে। ভাটিয়ালী গানে যে না পাওয়ার আর্তি, তা অতি উচ্চ পর্যায়ের এবং সে কারণে এ গান বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের প্রেম মাহাত্ম্যের সঙ্গে তুলনীয় বলে কেউ কেউ মনে করেছেন।[১২]

ভাটিয়ালী গান যে কেবল মাঝিরাই গায়, তা নয়। মাঠের কাজের অবসরে কৃষক বা বিশ্রামরত রাখালও ভাটিয়ালী সুরে গান গায়। মাঝিদের মধ্য থেকে এ গান শুরু হলেও পরবর্তীতে যে কেউ এই গান গায়।[১৩] এটি অলস সময়ের গান।

মুর্শীদা গানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জসীমউদ্‌দীন বলেছেন :

> মুর্শীদ মানে গুরু। যে গানে গুরুর প্রশংসা থাকে, অথবা যে গানে গুরুর নাম লইয়া ভক্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস থাকে, তাহাকে মুর্শীদা গান বলে। ... সব মুর্শীদা গানেই গুরুর প্রশংসা থাকে না। বহু মুর্শীদা গানে নৌকা, নদী, ঘর প্রভৃতি রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মুর্শীদা গানে খোদাতালার কাছে ভক্তের আত্মনিবেদন আছে। কিন্তু তবু সেগুলি মুর্শীদা গান বলিয়া অভিহিত।[১৪]

মুর্শীদা গানের জন্ম সম্পর্কে এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, এটি ভাটিয়ালী গানেরই পরবর্তী সংস্করণ এবং সুফীতত্ত্বের প্রণোদনায় 'ইসলামি প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই'[১৫] এ গানের জন্ম হয়েছে।

মুর্শীদা গান বিলম্বিত লয়ের। তাই এ গানের একমাত্র অনুষঙ্গ বাদ্যযন্ত্র হলো সারিন্দা। সারিন্দা ছাড়া অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র মুর্শীদা গানের বিলম্বিত সুর অনুকরণ করতে পারে না বলে মুর্শীদা গানে মূলত সারিন্দাই একক বাদ্য যন্ত্রানুষঙ্গ। অবশ্য কোনো কোনো মুর্শীদা গানে দোতারাও বাজানো হয়ে থাকে।

মুর্শীদ আরবি শব্দ, এর অর্থ আধ্যাত্মিক গুরু।[১৬] তাই মুর্শীদা গানে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা থাকে। মুর্শীদ বা গুরুকে উদ্দেশ্য করে এ গানে পল্লীগায়ক তার আপন জীবনের দুঃখময় কাহিনী বলে চোখের জল ফেলে। এ গানে আবেগের প্রাবল্য লক্ষণীয়। বাউল গান বুঝতে হয় বুদ্ধিযোগে আর মুর্শীদা গান অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে।[১৭] আবুল হাসান চৌধুরী বলেছেন, "মুরশিদি গানে ঐশী প্রেমের কথাই ব্যক্ত হয়, লৌকিক নর-নারীর প্রেমের কথা এতে নাই বললেই চলে। যদিও অনেক গানেই আছে রাধা-কৃষ্ণের রূপক।"[১৮] লোকসংগীত গবেষক আবুল হাসান চৌধুরীর এ মত গ্রহণ করা যায় না। কারণ মুর্শীদা গানে গায়ক/শিল্পী নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক গুরুর উদ্দেশ্যে গান গাইছেন, কিন্তু সে গানের বিষয় ওই গায়ক/শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের পাওয়া না পাওয়ার আনন্দ-বেদনার ইতিবৃত্ত। এভাবে মুর্শীদা গান আধ্যাত্মিক গুরুর উদ্দেশ্যে গীত হলেও এর বিষয় একান্ত ভাবেই মানবিক – সাধারণত অপ্রাপ্তির, বঞ্চনার, শোকের কথকতা। চোখের জলে গায়ক যে বেদনায় কথা বলেন, তা রক্তমাংসের মানুষেরই বেদনা।

বিচ্ছেদ গানও এক ধরনের ভাটিয়ালী। তীব্র, তীক্ষ্ণ একান্ত শোকগীতিকেই সাধারণ বিচ্ছেদ গান বলা হয়ে থাকে। বিষয়ের দিক থেকে ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে এ ধরনের গানের রয়েছে সাদৃশ্য এবং সুরের দিক থেকে মুর্শীদা গানের সঙ্গে এ গানের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। ভাওয়াইয়া গানের মতো বিচ্ছেদ গানের উপজীব্য নারীর ব্যথা-বেদনা ও প্রেমাকুলতা। ভাওয়াইয়ার মতো এ গানেও নারীরই প্রাধান্য। পল্লীর কোনো

কুমারী কন্যা অথবা বধূর প্রার্থিত পুরুষের জন্য আর্তি ও হাহাকার এ গানে করুণতম ভাষারূপ লাভ করেছে। ভাওয়াইয়া গানের মুখ্যভাব প্রেম এবং সে প্রেমে নারীর বিরহ-বিচ্ছেদজনিত হৃদয়ার্তি ও চিত্তদাহের ওপর জোর পড়েছে বেশি। এ জন্য একে বলা হয়েছে 'প্রেমিকার অশ্রুজল বিবৃতি'।[১৯] বিচ্ছেদ গানের প্রসঙ্গেও এ কথা সর্বাংশে প্রযোজ্য। নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষাজনিত হতাশা আর কান্নাই এ গানের মূল সুর। প্রেমে অপূর্ণতার বেদনা এর অনুভূতির বিষয়।[২০] এ গানে রক্তমাংসে গড়া নর-নারীর প্রেমই বিধৃত। এর প্রেম ও বিরহ একান্তভাবেই লৌকিক। জীবনাশ্রয়ী মানুষ এখানে অতিমানব নয়, তার জীবন কখনো অনাবশ্যকভাবে আদর্শায়িত হয় নি।[২১]

বিচ্ছেদ গানের সাথে মুর্শীদা গানের বৈসাদৃশ্য সুরে ও মিলে।

> মুর্শীদা গানের ধরন খাদের শেষ অক্ষরের সঙ্গে পরবর্তী খাদের শেষ অক্ষরের মিল থাকে না। প্রায় সুরই দুই লাইনে সীমাবদ্ধ। তাই এ গানে তেমন সুরবৈচিত্র্য থাকে না। ... এই ভাবে গান ইনাইয়া বিনাইয়া চলে। বিচ্ছেদ গান এরূপ নয়। ইহার ধরন খাদের শেষ অক্ষরের সঙ্গে পরবর্তী খাদগুলির শেষ অক্ষরের মিল থাকে। অধিকাংশ বিচ্ছেদ গানই ভগ্ন ত্রিপদীতে রচিত।[২২]

সুর ও অন্ত্যমিলের দিক থেকে মুর্শীদা গানের সাথে বিচ্ছেদ গানের অমিল থাকলেও মিল রয়েছে এর বিষয়ে। মুর্শীদা গানে মুর্শীদ বা গুরুকে উদ্দেশ্য করে গায়ক/শিল্পী তার বেদনার কথা বলেন ; অপরদিকে, বিচ্ছেদ গানে গায়ক/শিল্পী সরাসরি তার বিচ্ছেদজনিত হাহাকার প্রকাশ করেন। উভয় গানেই রয়েছে করুণ রসের প্রাবল্য। জসীমউদ্‌দীনের ভাষায় : "যাহারা ভাবের দ্বারা চোখের পানির দ্বারা আপন বাঞ্ছিতজনকে পাইতে চাহেন তাঁরাই মুর্শীদা ও বিচ্ছেদ গানের আশ্রয় লইয়া থাকেন।"[২৩]

আমরা আগেই বলেছি, জসীমউদ্‌দীন বিচ্ছেদ, ভাটিয়ালী, মুর্শীদাসহ প্রায় সব ধরনের পল্লীগীতিই রচনা করেছেন। এসব গান হয়ে উঠেছে গ্রামীণ জীবনাবেগের প্রামাণ্য দলিল। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষের হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতি তাঁর গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

এটা কিছু অপূর্ব নয় যে,বাংলা গানে, বিশেষ করে বাংলা লোকসংগীতে, পুরষের চেয়ে নারীর অনুভূতিই বেশি রূপায়িত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এসব গানে মেয়েলি আবেগ অনুভব প্রকাশ কিন্তু করেছে পুরুষেরাই। অন্য ভাবে বলা যায়, গান লিখেছে পুরুষ, কিন্তু সেসব গানে পুরুষের আবেগ-অনুভব সে রকম প্রকাশিত হয় নি, যেমন প্রকাশিত হয়েছে নারীর আর্তি ও হাহাকার। জসীমউদ্‌দীনের গানেও নারী-অনুভবের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। আমরা গুণে দেখেছি, জসীমউদ্‌দীনের ১০৯ টি গানের ভেতর পুরুষের আবেগ-অনুভব প্রকাশিত হয়েছে মাত্র ১৩ টি গানে; বাদবাকি

৯৬ টি গানেই শুনতে পাই নারীর কণ্ঠস্বর। জসীমউদ্‌দীনের এসব গানে নারীর আবেগ-অনুভূতির প্রকৃতি নির্ণয়ই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। বৈষ্ণব পদাবলিতে নায়ক-নায়িকার প্রেম সংঘটনের ধারাবাহিক চিত্র দেখা যায়। প্রথমে দেখা যায় পূর্বরাগ। পূর্বরাগ ধীরে ধীরে পরিণত হয় অনুরাগে, অনুরাগের পর আসে অভিসার পর্ব। অভিসারের মাধ্যমে ঘটে মিলন। মিলনের পরেই অবধারিতভাবে আসে বিরহের পালা। জসীমউদ্‌দীনের গানেও এ পর্যায়গুলো আছে তবে পদাবলির মতো সব সময় সুশৃঙ্খল ছক মেপে নয়। এতে প্রেম কখনো শুধু রূপানুরাগে বা আক্ষেপেই সীমাবদ্ধ, কখনো কখনো অভিসার, বা বিরহের একটি খণ্ডচিত্র লক্ষ করা যায়। জসীমউদ্‌দীনের গানে মিলনের চিত্র দেখা যায় না, অভিসারের চিত্র দু একটি; রূপানুরাগ আর বিরহের খণ্ড চিত্রই দেখা যায় সর্বাধিক। 'রাখালী', 'রঙিলা নায়ের মাঝি', 'পদ্মাপার', গাঙের পার' প্রভৃতি গীতিসংকলনগুলোতে জসীমউদ্‌দীন লোকসংগীতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, তেমনি লোকসংগীতের প্রতি দেশের সমকালীন শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন। দীর্ঘকাল কবি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে গ্রাম্যগান সংগ্রহ করেছেন। বিশেষ করে মুর্শীদা গানের প্রতি কবির ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। এ প্রসঙ্গে কবি একটি গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন :

> পঞ্চাশ বৎসর আগে হইতে আমি মুর্শীদা গানের অনুরাগী। এই সুদীর্ঘ সময়ে কত শত শত ফকীরের বৈঠকে যাইয়া সারারাত্র জাগিয়া এই গান শুনিয়াছি। এই গান শোনা আমার একটি নেশায় পরিণত হইয়াছে। এখনও অন্ততঃ মাসে একবার কোনো গ্রামে যাইয়া অথবা গ্রাম হইতে গায়কদল আনাইয়া মুর্শীদা গান শুনিয়া সারারাত জাগিয়া কাটাই।[২৪]

প্রচলিত গ্রাম্যগানের সুরে ও ঢঙে জসীমউদ্‌দীন নতুন গান লিখেছেন। কোথাও গ্রাম্যগানের দু একটি পঙ্‌ক্তিকে ভাবসূত্র রূপে গ্রহণ করে আপনার পথে অগ্রসর হয়েছেন, কোথাও প্রচলিত গ্রাম্যগানকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশ করেছেন– কোথাও সামান্য পরিবর্তন করে,কোথাও ভাষান্তরিত করে কোথাও বা সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখেও গানগুলো প্রকাশ করেছেন।[২৫] প্রচলিত গ্রাম্যগানগুলোর সকল পঙ্‌ক্তি গ্রহণ না করে নতুন করে লেখার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন গানগুলোর অশ্লীলতা । তাঁর ভাষায় :

> ...বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি জানিতাম গ্রাম্য কোন্ সুরটি রেকর্ড করাইলে শ্রোতারা খুব পছন্দ করিবে। হয়তো একটি গান পাওয়া গেল – তার প্রথম লাইনটি খুব সুন্দর। সুরও হৃদয়গ্রাহী কিন্তু পরবর্তী লাইনগুলি অশ্লীল। আমি সেখানে নতুন পদ জুড়িয়া দিয়া গানটিকে শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতাম।[২৬]

প্রচলিত গ্রাম্যগানের ঢঙে ও সুরে তিনি গান রচনা করেছেন বটে কিন্তু

> তাই বলে তাঁর গানগুলো গ্রাম্যগানের নিছক অনুকৃতি মাত্র নয়; ভাবে, ভাষায়, সুরে গ্রাম্যগানের মূল বৈশিষ্টটি রক্ষা করেও তা নতুন সৃষ্টির মহিমা লাভ করেছে।

> জসীমউদ্‌দীন একজন সচেতন শিল্পীর ন্যায় গ্রাম্যগান থেকে ভাবসংকেত গ্রহণ করে, ক্ষেত্র বিশেষে গ্রাম্যশব্দ, উপমা গ্রহণ করেও, ভাষার উপযুক্ত পরিমার্জন দ্বারা ঐগুলোকে উপযুক্ত কলাসম্মত রূপ দান করেছেন। তাঁর গ্রাম্যগান ভাষা ও ভাবের গ্রাম্যতা থেকে আশ্চর্যরূপে মুক্ত। সাধারণ গ্রাম্যগানের আঞ্চলিকতা দোষ অতিক্রম করে এ গান সর্বস্তরে মানুষের মনে মনে সংক্রমণ-প্রয়াসী। তথাপি গ্রাম্যগানের বিশেষত্বগুলো যথাসম্ভব বজায় রয়েছে তাঁর গানে। এখানেই তাঁর গ্রাম্যগান রচনার সার্থকতা।[২৭]

কবিতার মতো গানেও জসীমউদ্‌দীন গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনের আবেগকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

> বস্তুতঃ গানের দেশ বালাদেশের মনের পরিচয় রয়েছে এর পল্লীর লোকের মুখে মুখে প্রচলিত অজস্র গীতির মধ্যে। এ গানগুলোর মধ্যে জনসাধারণের প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-বিচ্ছেদ, বেদনার কথা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাদের আধ্যাত্মিক আকুলতার পরিচয়।[২৮]

আমরা আগেই বলেছি, বৈষ্ণব পদাবলিতে নায়িকার প্রেম-সংঘটনের যে ধারাবাহিক চিত্র দেখা যায়, জসীমউদ্‌দীনের গানে তা পুরোপুরি নেই। বৈষ্ণব পদাবলির ক্রম বিকাশকে আদর্শ হিসেবে ধরলে নায়িকাকে প্রেমের মোট পাঁচটি পর্বে দেখা যায়-- এ পর্বগুলো হচ্ছে : রূপানুরাগ, অনুরাগ, আক্ষেপ, অভিসার ও বিরহ। এ ছাড়াও পাওয়া যায় নারীর বিবাহিত জীবনে পতিপ্রেম, স্বামীর সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা তথা বাবার বাড়িতে 'নাইওর' যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, এবং বিধবার যৌবনজ্বালা। নায়িকার উল্লিখিত পঞ্চ অবস্থায় এবং স্বামীর সংসারে নারীর পূর্বোক্ত তিন পরিপ্রেক্ষিতে নারীর কণ্ঠস্বর এবার ধারাবাহিকভাবে শোনা যাক :

**রূপানুরাগ**

'রঙিলা নায়ের মাঝি' বইয়ের ১৪ সংখ্যক গান 'দেখলাম পথ ধারেরে সজনি' গানটি মুর্শীদা ও রাখালী মিশ্র প্রকৃতির। এ গানে প্রেমাস্পদ পুরুষকে দেখে নারীর চিত্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে :

দেখলাম পথ ধারেরে সজনি
ওই সোনার বরণরে খানি,
সিঁদুরিয়া মেঘের থইনরে
বুকে তীর গেল হানি!
... ... ... ... ... ... ...
বাহুখানি না হইয়া হৈত যদি রশি,

জুড়াইতে মনের জ্বালারে গলায় বানতাম কসি,
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
সে রূপ আগুন হইলে অঞ্চলে জড়াইয়া
এ মোর দুস্কের প্রাণ দিতাম পুড়াইয়া
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
যেনা পন্থে গেল চইলা রাঙা পাও ফেলে,
মনে লইল বুকখানি দেই সেথা মেলে;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
মনে হইল ফুল হয়া ঝরি পন্থ পরে
দুখানি পায়ের তলে যাই যে গো মরে;[২৯]

এই গানের অন্তত দুটো জায়গায় বৈষ্ণব পদকর্তা গোবিন্দদাসের দুটি বিখ্যাত পদের ছায়াপাত ঘটেছে।

জসীমউদ্‌দীনের পাঠ :

দেখলাম পথ ধারে রে সজনি
ওই সোনার বরণ রে খানি
সিঁদুরিয়া মেঘের থইনরে
বুকে তীর গেল হানি!

গোবিন্দদাসের পাঠ :

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥[৩০]

জসীমউদদীনের পাঠ :

যেনা পন্থে গেল চইলা রাঙা পাও ফেলে
মনে লইল বুকখানি দেই সেথা মেলে

গোবিন্দদাসের পাঠ :

যাঁহা পঁহু অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥[৩১]

স্মরণ করা যেতে পারে, জসীমউদ্‌দীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র এবং পরবর্তীকালে শিক্ষক ছিলেন, বৈষ্ণব পদাবলী তাঁর কাছে সুপরিচিত ছিল। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় জসীমউদ্‌দীনের গানে বৈষ্ণব পদাবলির প্রভাব সম্পর্কে বলেছেন : "..কবি যেন বৈষ্ণব কবিদের সুরেই সুর মিলিয়েছেন।"[৩২] "এ জাতীয় গানে বৈষ্ণব

পদাবলীর রাধার বিচ্ছেদ-বেদনার সুরটির প্রতিধ্বনি প্রায়শঃ শোনা যায়।"[৩৩] পার্থক্য শুধু এই যে, গোবিন্দদাস যেখানে রাধারূপের বর্ণনা দিয়েছেন, জসীমউদ্‌দীন সেখানে নায়িকার চোখে প্রেমাস্পদ পুরুষের রূপ বর্ণনা করেছেন। ১৫ সংখ্যক 'আমার প্রাণ কান্দে তার রূপ হেরে' গানটি একটি বিচ্ছেদ গান। কবি এখানে কৃষ্ণের প্রতীকে প্রেমাস্পদ পুরুষের প্রতি রূপানুরাগ প্রকাশ করেছেন। কৃষ্ণ কালো, গ্রাম্যবালার পছন্দের পুরুষটিও কালো রঙের বলেই হয়তো এ প্রতীক ব্যবহার। তদুপরি, কৃষ্ণ সব সময় কবিদের চোখে প্রেমিক পুরুষের সার্থক প্রতীক :

জলের ছায়ায় ওই কালো রূপ হেরিব নয়নে
জলে ঢেউ দিলে আজ অভাগীরে বধিবি পরাণেরে;
ও প্রাণ সখি।
সাধ করিয়া দিলাম নয়ন শ্যাম বন্ধুর পানে,
আমার নয়ন ছাড়িয়া রূপ লাগিল পরাণেরে [৩৪]

কবির একটি ভুল এখানে লক্ষণীয়। নদীর তরঙ্গময় ঘোলা জলে মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হওয়ার কথা নয়, মেয়েটি কী ভাবে আপন মুখচ্ছবির মধ্যে প্রেমিক পুরুষটির রূপ দেখতে পেলেন ?

১৬ সংখ্যক গান 'আমার বন্ধু বিনোদিয়ারে' গানে রূপানুরাগের প্রগাঢ় পরিচয় মেলে। সখীর কাছে দুঃখের কথা বলছেন নায়িকা। প্রেমিক পুরুষের রূপে মজে তিনি দশমী দশায় উপনীত। তার আসলে যে কী হয়েছে, তা তিনি পুরোপুরি নিজেই জানেন না। প্রেমাস্পদ তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। এ সময় পল্লীবালা বিষপানে আত্মহত্যা করার জন্য উন্মুখ, যদি তাতে বিরহ যন্ত্রণার অবসান হয়। খুব চমৎকার এ গানটি :

আমার বন্ধু বিনোদিয়ারে
প্রাণ বিনোদিয়া;
আমি আর কতকাল রইব আমার
মনেরে বুঝাইয়ারে
প্রাণ বিনোদিয়া।
কি ছিলাম কি হইলাম সইরে, কি রূপ হেরিয়া
আমি নিজেই যাহা বুঝলাম না সই, কি কব বুঝাইয়ারে
প্রাণ বিনোদিয়া।
চোখে তারে দেখলাম সইরে পুড়ল তবু হিয়া
আমার নয়নে লাগিলে অনল নিবাইতাম কাঁদিয়ারে
প্রাণ বিনোদিয়া

মরিব মরিব সইরে যাইব মরিয়া
আমার সোনা বন্ধুর রূপ দিও গরলে গুলিয়ারে
প্রাণ বিনোদিয়া
আগে যদি জানতাম বন্ধু যাইবা ছাড়িয়া
আমি ছাপাইয়া রাখতাম আমার পাঁজর চিরিয়ারে
প্রাণ বিনোদিয়া।[৩৫]

জসীমউদদীনের অসম্ভব জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে এ গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯ সংখ্যক 'ও মোহন বাঁশি' একটি বিচ্ছেদ গান। এ গানেও পল্লীবালা তার প্রেমিক পুরুষকে রূপায়িত করেছেন কৃষ্ণের প্রতীকে :

কলসী ভরার ছলে
তোমার ছায়া দেখব জলেরে কানাই
হারায়ে পায়ের নূপুর
ঘরে নাহি যাব ফিরেরে কানাই! [৩৬]

'পদ্মাপার' বইয়ের ১০ সংখ্যক গান 'কি যে দেইখাছি আমি'-তেও নায়িকার রূপানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তর ভরে তিনি দেখেছেন নায়কের রূপ। সে রূপ যে কেমন, তার বর্ণনা দিতে তিনি অক্ষম। রূপ দেখে নায়িকার শুরু হয়েছে বিষম মর্মদাহ :

অন্তর ভরিয়া আছে (শুধু) জ্বালাপুড়া তারি
কি যে দেইখাছি আমি মুখে কইতে নারি।[৩৭]

২০ সংখ্যক গান 'সোনা বন্ধুর সনে' রূপানুরাগের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ গানেও নায়িকা নায়ককে রূপায়িত করেছেন কৃষ্ণ-প্রতীকে :

সোনা বন্ধুর সনে দেখা হবে বলে সখিলো
আমি জল আনতে যাই;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
চেয়ে রব দূরান্তরে যেথা প্রাণের কানাই;
ও নয়ন জল ফেলে জল ভরব সখিগো, যতদিন তারে না পাই।[৩৮]

২১ সংখ্যক গান 'ওই না রূপে নয়ন দিয়ে' জসীমউদ্‌দীনের অসম্ভব জনপ্রিয় গানগুলোর একটি। নায়কের রূপ দেখে নায়িকা পাগলিনী হয়ে উঠেছেন, ঠিক করেছেন

তিনি ঘরে থাকবেন না, কুলমানের পরোয়াও তিনি করেন না। দেশান্তরী হয়ে তিনি যমুনা তীরে চলে যাবেন, যেখানে তিনি একদা দেখেছিলেন তার প্রেমিক পুরুষটিকে :

ওই না রূপে নয়ন দিয়ে আমার
গৃহে থাকা হইল দায়
আমার প্রাণ যায়।

... ... ... ... ... ... ... ... ...
আমি এ ঘরে ত রব না, এ কুলমান রাখব না
আমি পাগলিনী হয়া গো যাব
আমি দেশান্তরী হয়া গো যাব যমুনায়
আমার প্রাণ যায়।[৩৯]

## অনুরাগ

'রঙিলা নায়ের মাঝি' গ্রন্থের ২ সংখ্যক গান 'আরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি' একটি মুর্শীদা গান। নায়িকা কলসি নিয়ে জল আনতে গিয়েছিলেন নদীর ঘাটে। সেখানেই নায়কের সাথে তার দেখা হয়। নায়ক ভিনদেশি মাঝি। তার কণ্ঠে ভাটিয়ালী গান শুনে নায়িকা তার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ অনুভব করছেন :

তোমার ভাইটাল সুরের সাথে সাথে কান্দে গাঙের পানি
ও তার ঢেউ লাগিয়া যায় ভাসিয়া কাঙ্খের কলসখানি।
পূবালী বাতাসে তোমার নায়ের বাদাম ওড়ে
আমার শাড়ীর অঞ্চল ধৈরয না ধরে [৪০]

১৭ সংখ্যক গান 'ও প্রাণ বন্ধুরে' একটি বিচ্ছেদ গান। নায়কের বাঁশির সুর শুনে অনুরাগিণী হয়ে উঠেছেন পল্লীবালা :

যে দিন ও বাঁশি শুনালে
কাঞ্চা বাঁশে ঘুণ ধরালে
আমায় করলে ঘরের বার [৪১]

২২ সংখ্যক গান 'বদল বাঁশী' একটি বিচ্ছেদ গান। এ গানেও নায়ক কৃষ্ণের প্রতীকে রূপায়িত। নায়কের বাঁশি শুনে নায়িকা দিওয়ানা। যে বাঁশি তাকে উন্মনা করেছে, সেই বাঁশিটি নায়িকা নিজের কাছে পেতে চান :

বদল বাঁশি
ওরে বন্ধু দিয়ারে যাও
বদল দিয়া যাও

নইলে এই দাসীরে
সঙ্গে লয়ে যাও
রে প্রাণনাথ।[৪২]

'পদ্মাপার' গ্রন্থের ১৫ সংখ্যক গানেও বাঁশি শুনে নায়িকার চিত্তচাঞ্চল্য জেগেছে। তিনি অনুভব করেন, বাঁশি বনের মধ্যে নয়, বাজছে তাঁর মনের ভেতর। কুলের গর্ব তিনি যমুনায় ভাসিয়ে দিতে প্রস্তুত। কলঙ্ককে তার মনে হয় চন্দনশোভা :

কুলের গরবী যারা কুল লয়ে থাকুক তারা
মোর কূল যমুনাতে ভাসল,
আমার কলঙ্ক দিয়ে, কালো হয়ে আছে পিয়ে
সে কাল-কলঙ্ক মোর চন্দন সাজালো।[৪৩]

জসীমউদ্‌দীনের এই পঙ্‌ক্তিগুলোয় চণ্ডীদাসের একটি পদের দূর ছায়াপাত ঘটেছে বলে আমরা অনুমান করি :

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥[৪৪]

১৬ সংখ্যক গান 'ও আমার বন পুড়ান' তেও নায়কের বাঁশি শুনে নায়িকাকে আকুল হতে দেখা যায়। নায়কের বাঁশি শুনে নায়িকার কাজকর্ম এলোমেলো হয়ে যায় :

যখন বন্ধু বাজায় বাঁশি
তখন আমি রানতে বসি গো
ও আমি রানতে বসে কানতে বসি
হলুদ দেই লবণ দেবার।[৪৫]

এ গানের শেষ স্তবকে রাধারূপিণী পল্লীবালা যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

## আক্ষেপ

আক্ষেপ বিষয়ক গানগুলোতে দেখা যায় নায়িকা এই ভেবে অনুশোচনা করছেন যে, তিনি কেন প্রেম করলেন। চণ্ডীদাসের রাধা যেমন বলেছিলেন :

সই, কে বলে পিরীতি ভাল
হাসিতে হাসিতে পিরীতি করিয়া
কান্দিতে জনম গেল।[৪৬]

জসীমউদ্‌দীনের নায়িকাও তেমনি বলেন:

আমি কেন বা পিরীতিরে করলাম।
আমার ভাবতে জনম গ্যাল রে,
আমার কানতে জনম গ্যাল রে।[৪৭]

এই আক্ষেপ-অনুশোচনায় আক্ষেপ পর্বের গানগুলো হয়ে উঠেছে অপরূপ সৃষ্টি।

'রাখালী' কাব্যের মেয়েলি গান 'সিঁদুরের বেসাতি' তে সহজ-সরল পল্লীবালাকে আক্ষেপ করতে দেখা যায়। ফেরিওয়ালা বেনের কাছ থেকে বিনামূল্যে তিনি সিঁদুরসহ আরো কিছু সাজসজ্জার উপকরণ পেয়েছিলেন। বিদেশি রসিক ফেরিওয়ালা দৃশ্যপট থেকে অন্তর্ধান হবার পর থেকেই মেয়েটি তার জন্য আকুলতা অনুভব করতে থাকেন। আক্ষেপ করে সখীর কাছে তিনি বলেন :

শাখা না কিনিতে আমি হাতে বান্ধলাম ডোর
সিঁথির সিন্দুর কিনে চক্ষে দেখি ঘোর।
নথ না কিনিয়া আমি পথে করনু বাসা
একেলা কাঁদিয়া ফিরি লয়ে তারি আশা।[৪৮]

ঘাটু-গান 'মনই যদি নিবি' তেও সেই আক্ষেপের রেশ লক্ষ করা যায়। নায়িকা হাহাকার করে বলেন :

মনই যদি নিবি কেন মন করিলি খালি
'কাঞ্চা' বাঁশে আগুন দিয়ে বাড়ালি ধুঁয়ালীরে
রে পরাণ বন্ধু![৪৯]

কাঁচা বাঁশে আগুন দেবার চিত্রকল্পটি কবি সংগ্রহ করেছেন লোকজ জীবন থেকে। কাঁচা বাঁশে আগুন ধরালে তা পুড়ে শেষ হতে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সময় নেয় এবং সেই সঙ্গে উৎপন্ন করে প্রচুর ধুঁয়া যা রাঁধুনির চোখে জল এনে দেয়। সহজ-সরল পল্লীবালার নায়কের প্রেমে পড়া যেন কাঁচা বাঁশে অগ্নিসংযোগের মতোই জ্বালাময়ী দাহের অশ্রুসজল দীর্ঘ প্রহর।

২০ সংখ্যক গানের প্রথম কলি 'যদি বনবাসী রইলারে বনে'। এটি একটি মুর্শীদি গান। এ গানে আক্ষেপ করে নায়িকা বলেছেন :

বাতাসে উড়াইলাম ঘুড়ি আকাশ ধরিতে
সেও ঘুড়ি কোথায় গেল দেখিতে দেখিতে
রে দরদী।

কলসী ভাসাইলাম সৌতে জলের লাগিয়া
সেও সৌত পালায়া গেল কলসী লইয়া
রে দরদী।[৫০]

এ গানটি জ্ঞানদাসের একটি পদ স্মরণ করিয়ে দেয় :

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি
শীতল বলিয়া এ চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥[৫১]

২৩ সংখ্যক পদটি একটি বিচ্ছেদ গান, প্রথম কলি 'ও মোরে কান্দালি তুই মনের মত'। এ গানটিতে লোকজ জীবনাভিজ্ঞতার চমৎকার প্রয়োগ রয়েছে। পল্লীবালা আক্ষেপ করে বলছেন, প্রেমিক পুরুষটি যেন ভেজা কাঠে আগুন দিয়ে তার হৃদয়কে দগ্ধ করছে, উপরন্তু দহন প্রক্রিয়া তরান্বিত করার জন্য মাঝে মাঝেই তুষের গুঁড়া ছড়িয়ে দিচ্ছে :

ভিজা কাষ্ঠে আগুন দিয়ে
ও তুই পোড়ালি আমার হিয়ে
তাহাতে তুষের গুঁড়া
আর ছড়াবি কত।[৫২]

ভেজা কাঠে আগুনের বিলম্বিত দহন প্রক্রিয়ার কথা আমরা ইতোপূর্বে একবার বলেছি, এবার তুষের গুঁড়ার ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা যাক : গ্রামীণ চুলায় রাঁধুনিরা চুলার আগুন উসকে দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে তুষের গুঁড়া ছড়িয়ে দেন। এর ফলে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে আর সহজে নেভে না। তুষ কখনো পুড়ে কয়লা বা ছাই হয়ে যায় না, ফলে আগুনও নেভে না। কাঠ পুড়ে গেলে এক সময় তা কয়লা আর ছাই হয়ে যায়, তারপর আগুন নিভে যায়। তুষের আগুন কখনো নেভে না, সব সময়ই ধিকিধিকি জ্বলে। ভেজা কাঠে তুষের আগুন দিয়ে নায়িকার চিত্তদাহের যে চিত্রকল্প এ গানে রূপায়ণ করা হয়েছে, তা অনবদ্য, তুলনারহিত সৃষ্টি।

৩৯ সংখ্যক গান 'আগে জানি নারে দয়াল' একটি মুর্শীদা গান। প্রেম করার আগে পল্লীবালা কল্পনাও করতে পারেন নি, প্রেমের এতো জ্বালা। এটি জসীমউদ্‌দীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান হিসেবে বিখ্যাত :

আগে জানি নারে দয়াল
এমন হবেরে
আগে জানি নারে সানাল
পরান যাবেরে
আগে না জেনে পিছে না শুনে প্রেম যে জন করে
যে সে ঘষির অনল তুষের ধূঁয়া সদাই জ্বইলা জ্বইলা উঠেরে[৫৩]

ঘষির আগুন সহজে নেভে না – দীর্ঘ সময় ব্যাপী জ্বলে। ঘষির আগুনের রূপকটি কবি গ্রামীণ লোকজ জীবন-সংস্কৃতি থেকে আহরণ করেছেন।

'পদ্মাপার' গ্রন্থের ৬ সংখ্যক গানের প্রথম কলি 'ও তোর নাম শুনিয়ারে'। এ গানে কবি তাঁর প্রেমাস্পদকে দোষী সাব্যস্ত করে এই অনুযোগ প্রকাশ করেছেন যে, আমি না হয় জানতাম না প্রেমের জ্বালা কেমন। কিন্তু তুমি তো জানতে। তাহলে জেনে শুনে কেন তুমি কদম তলায় বাজালে তোমার মোহন বাঁশি? আমি অবলা নারী, প্রেমে তো পড়বোই। এখন যে আমি প্রেম-সাগরে নাকানি চুবানি খাচ্ছি, যে সাগরের কূল নাই, কিনারা নাই :

সাগরে উঠিয়া ঢেউ কূলে আইসা পড়ে
কূল নাই কিনারা নাই কুল-কলঙ্কিনীর তরে
কান্দিয়া কান্দাব বন্ধু! এমন দোসর নাই
আমি সাজায়ে ব্যথার চিতা নিজ হাতে জ্বালাইরে।
তুমি ত জানিতে বন্ধু প্রেমের কত জ্বালা
তবে কেন পরিলে গলে আমার ফুলের মালা
তবে কেন কদম্ব তলে বাঁশরী বাজালে
কিবা অপরাধে বন্ধু অবলা বধিলেরে।[৫৪]

## অভিসার

জসীমউদ্‌দীনের গানে নারীর অভিসারের একমাত্র চিত্র পাওয়া যায় 'রঙিলা নায়ের মাঝি' গ্রন্থের ১০ সংখ্যক গান 'নিশিথে যাইও ফুল বনে' তে। এটি একটি ভাটিয়ালী

গান। বাণী-অনুষঙ্গে অনুমান করা যায়, এটি একটি পরকীয়া প্রেমের অভিসার। নায়িকা নায়ককে 'ভোমরা' সম্বোধন করে রাতের বেলা ফুলবনে দেখা করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রার্থীত পুরুষের সঙ্গে দেখা হলেও নায়িকা ঘনমিলন থেকে দূরে থাকার জন্যে নায়ককে পরামর্শ দান করেছে সুচতুভাবে :

নিশিথে যাইও ফুলও বনে
রে ভোমরা
নিশিথে যাইও ফুলও বনে।
জ্বালায়ে চান্দের বাতি
আমি জেগে রব সারা-রাতি গো;
... ... ... ... ... ... ... ... ...
আমার ডাল যেন ভাঙে না
আমার ফুল যেন ভাঙে না,
ফুলের ঘুম যেন ভাঙে না।[৫৫]

জ্যোৎস্নাস্নাত রাতে ফুলবনে অভিসার যাত্রার চিত্রটি চমৎকার, এবং বাকচাতুর্যে অনন্য। উল্লেখ্য, এটি জসীমউদ্‌দীনের একটি বিখ্যাত গান।

## বিরহ

'রাখালী' কাব্যের 'বৈদেশী বন্ধু' একটি বারমাসি গান। এ গানে দেখা যায় : ধান কাটতে কামলার দলে এসেছিল ছেলেটি। তার প্রেমে পড়েছে কৃষক কন্যা। মেয়েটি তার ভালোবাসার কথা ছেলেটিকে বলে নি অথবা বলতে পারে নি। ধান কাটার কাজ শেষ হলে ছেলেটি চলে যায়। তখন মেয়েটি বিরহ বেদনায় গুমরে মরে। এ গানে শোনা যায় কৃষককন্যার হাহাকার :

আমার দেশে ধান কাটিতে মন কাটিয়া গেলে,
ধানের দামই নিয়ে গেলে মনের দামটা ফেলে।
সেই না ধানের খেতে আবার ঐব ধান,
শাওইনা পানিতে ভাসপো কাজইলা আসমান।
আমার মনেতে বন্ধু শুধুই চত্রিক মাস,
দুপুইরা আসমান ছাড়ে আগুনীর শ্বাস।[৫৬]

'রঙিলা নায়ের মাঝি' গ্রন্থের ৫ সংখ্যক গানের প্রথম কলি 'গাঙের কূলরে গেল ভাঙিয়া'। এটি একটি ভাটিয়ালী গান। এ গানে বিধৃত হয়েছে নারীর বিরহের আর্তি ও হাহাকার :

আর ত আশা নাইরে বন্ধু
খুলি মাথার কেশ,
কালিয়া রাতের ছায়ে
ঘিরিল যে দেশ;
আকাশের যত তারা
গণিয়া করিলাম সারা,
বিরহের রাতি নাহি
গেল পোহাইয়ারে।[৫৭]

১৮ সংখ্যক গান 'রজনী হইয়াছে বাসি' একটি রাখালী গান। এ গানে রাধা-কৃষ্ণের প্রতীকে নায়িকা ও নায়কের পরিচয় মেলে। ছেলেটি আসবে এই আশায় মেয়েটি সারারাত নির্ঘুম থেকে এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তার হয়ে কবি কৃষ্ণরূপী প্রেমিকের উদ্দেশ্যে বলেন :

ও তুমি এখনো রাধারে ঘুমাতে দাও।
তোমার আসার লাগি
সারা নিশি জাগি জাগি
চাঁদের ডুবেছে বাঁকা নাও;
এখন যে বিধুমুখী
ঘুমায়েছে বড় দুখী
শিথিল শয়নে মেলে গাও[৫৮]

প্রায় একই ধরনের চিত্র পাওয়া যায় ৪১ সংখ্যক বিচ্ছেদ গানটিতে। গানের প্রথম কলি 'এখনো এল না কালা'। এ গানটিতেও রাধা-কৃষ্ণ প্রেমিক-প্রেমিকার প্রতীক হিসেবে রূপায়িত হয়েছে। নায়িকার হাহাকার শোনা যায় পুরো গান জুড়ে :

এখনো এল না কালা
মন আমার হল উদাসী
বাড়িল বিরহ জ্বালা
নির্বাণের উপায় কি করি।
শ্যামের আসার আশা নিয়ে
বাসর-সজ্জা সাজাইয়ে

জেগে পোহাই সারা নিশি
... ... ... ... ... ... ... ...
আসবে বলে চিকন কালা
গাঁথিলাম বন-ফুলের মালা
সেও মালা মোর হৈল বাসি[৫৯]

'পদ্মাপার' গ্রন্থের ১৯ সংখ্যক গান 'আমার দুরন্ত প্রাণ'- এ নায়িকার বিরহ প্রকৃতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে :

কালিয়া মেঘের রাতি আজি কান্দে থাকি থাকিরে
হিয়া যদি পাখি হইত, পিঞ্জিরাতে বন্দী রইত
সইত দুস্ক মনের মধ্যে রাখি
সে যে শিমুলের তুলা হয়ে ফেরে বাতাসরে ডাকিরে[৬০]

৩০ সংখ্যক গান 'কোন বা দেশে যাব রে' বিরহ বেদনাতে কাতর নায়িকা প্রেমাস্পদ পুরুষের সন্ধানে দেশান্তরী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন :

কোন বা দেশে যাব রে
আমার বন্ধুর তালাসে
নয়নের জল প্রদীপ কইরা
আমি ঘুরব তার আশে।[৬১]

৩৩ সংখ্যক গান 'আমি বুঝি মইলাম সই'-এ বিরহজ্বালা থেকে পরিত্রাণের আশায় নায়িকা আত্মহত্যা করার কথা ভেবেছেন :

কি জ্বালায় জ্বলছে অন্তর কারে কবরে গিয়া
মইলেনি মোর জুড়ায় জ্বালা আন জহর গুলিয়া[৬২]

৫২ সংখ্যক গানের প্রথম কলি 'আমার গলার হার'। এ গানে রাধার প্রতীকে নারীর বিরহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমাস্পদ পুরুষ কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে নেই, তখন রাধা অলঙ্কার পরে থাকার কোনো সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছেন না। সখি ললিতাকে তিনি

তার গলার হার খুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছেন। গলার হারে তিনি আর কোনো শোভা খুঁজে পান না। তিনি ভাবছেন : পরতেই যদি হয় তাহলে অন্তিমকালে তার গলায় যেন কৃষ্ণ নামের মালা গেঁথে পরিয়ে দেওয়া হয়। বিরহ বেদনায় মৃত্যু যখন ওষ্ঠাগত, তখনো তিনি তার প্রেমাস্পদ পুরুষের নামাবলি গলায় ধারণ করতে চান অন্তিম আকাঙ্ক্ষা হিসেবে :

আমার গলার হার খুলে নে ওগো ললিতে
আমার হার পরে আর কি ফল হবে সখি
(ও যার) প্রাণ বন্ধু নাই ব্রজেতে।
আর হারে কি আর শোভা আছে
যার শোভা তার সঙ্গে গেছে গো;
কৃষ্ণ নামের মালা গেঁথে সখি দেনা আমার গলেতে।[৬৩]

বিরহিণী নারীর এ আর্তি মর্মকে স্পর্শ করে। এটি জসীমউদ্‌দীনের জনপ্রিয় গানগুলির একটি।

বিরহকে বলা হয়েছে 'প্রেমের সর্বোত্তম অংশ'।[৬৪] এই সর্বোত্তম অংশের রূপায়ণে জসীমউদ্‌দীন যে অসাধারণ সফল রূপকার, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

জসীমউদ্‌দীনের গানে রক্তমাংসের পূর্ণাঙ্গ নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তাঁর নারীর মন শুধু কথা বলে না, দেহও কথা বলে। রঙিলা নায়ের মাঝি গ্রন্থের ৪৫ সংখ্যক গানে নারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় যৌবনজ্বালা :

হাত ধরিয়া কও যে কথা
শোন্ বোষ্টম বাউদিয়া
অল্প বয়সে মোর স্বামীটা
গেইছে মরিয়া।[৬৫]

নারীর পতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় একই গ্রন্থের ৪৬ সংখ্যক গান 'সউগ ফুল ফুটিলরে মোর' -এ। এটি একটি বিয়ের গান। স্বামী বাণিজ্যে গেছে, ছয় মাস যাবৎ তার সঙ্গে দেখা নেই। ঘরে স্বামী অনুপস্থিত, তাই সাজসজ্জায় স্ত্রীর কোনো আগ্রহ নেই। স্বামীর প্রতীক্ষায় স্ত্রী দিন গোণেন :

ওরে ছয়মাস হৈল সোয়ামী বাণিজ্যে যাবার
মাথায় নাই দেও কাঁকইরে
ফুল মোর ফুটিলরে।[৬৬]

'পদ্মাপার' গ্রন্থের ২৪ সংখ্যক গান 'ও বন্ধু রঙিলা'-য় নারীর পতিপ্রেমের একটি মধুর চিত্র পাওয়া যায়। বিরহিণী স্ত্রী মুগ্ধা প্রেমিকার মতো বলেছেন :

ও বন্ধু রঙিলা রঙিলা রঙিলারে
আমারে ছাড়িয়ারে বন্ধু কই গেলারে
কই গেলারে বন্ধু কই রইলারে
তুমি হইও চান্দরে বন্ধু আমি গাঙের পানি
জোয়ার ভাটাতে হবে নিতুই জানাজানিরে
বন্ধু নিতুই জানাজানি
তুমি হইও ফুলরে বন্ধু! আমি হব হাওয়া
দেশেবিদেশে ফিরব আমি হইয়া মাতেলারে
হইয়া পাগেলারে
আমারে ছাড়িয়ারে বন্ধু! কই গেলারে
সেইকালে কইছিলারে বন্ধু হস্ত দিয়া মাথে
তোমার গলার ফুল হইয়া ফুইটা রব সাথেরে
আমি ফুইটা রব সাথে
আমার খালি কণ্ঠ খালি রইল না পরিলাম মালা
না আইল মোর প্রাণের পতি ডুইবা গেল বেলারে
আমারে ছাড়িয়ারে বন্ধু! কই গেলারে।[৬৭]

পতিপ্রেমের এই চিত্রটির বিপ্রতীপ চিত্রও জসীমউদ্‌দীনের গানে পাওয়া যায়। 'পদ্মাপার' গ্রন্থের ২ সংখ্যক গান 'কে যাসরে রঙিলা মাঝি'-তে স্বামিগৃহে অসুখী নারীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণার পাশাপাশি এ গানে উচ্চারিত হয়েছে বাবার প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমান :

পরের ছেলের সঙ্গে বাজান আমার দিল বিয়া
এক দিনের তরে আইসা না গেল দেখিয়া
জনমের মত গেল বনবাসে দিয়া
এবার জুড়াইব মনের দুস্কু সায়রে ডুবিয়ারে।[৬৮]

পরিশেষে বলা যায়: জসীমউদ্‌দীনের গানে নারী আদ্যোপান্ত রক্তমাংসের মানুষ। সে প্রবল আবেগপ্রবণ। সে যেমন বুক উজাড় করে ভালোবাসতে জানে, তেমনি

প্রেমাস্পদ পুরুষের ভালোবাসাও কামনা করে গভীরভাবে। স্বামীর সংসারে সে হয়তো সুখী কিংবা অসুখী – সেটা তার বড় পরিচয় নয়, তার বড় পরিচয় হলো : স্বামীকে নিয়ে সে সুখী হতে চায়। জসীমউদ্‌দীনের গানে আবহমান পল্লীবাংলার সহজ-সরল নারীই স্বকণ্ঠে কথা বলেছে।

## তথ্য সঙ্কেত


১. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, *জসীমউদ্‌দীন*, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ,২০০২, পৃ. ১৩৮

২. ঐ, পৃ. ১৯৪

৩. জসীমউদ্‌দীন, *ধান খেত*, ঢাকা, অষ্টম সং, ২০০৬, পৃ. vii

৪. সিরাজউদ্দীন কাসিমপুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি*, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৬৬

৫. করুণাময় গোস্বামী, 'ভাটিয়ালী গান', *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৪ এপ্রিল, ১৯৯৬

৬. আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেমচেতনা*, ঢাকা, ২০০১, পৃ.৪১

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর*, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১৫৮৩

৮. আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৯. আশরাফ সিদ্দিকী, *লোকসাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৩, পৃ. ৩৩৭

১০. ওয়াকিল আহমদ, *মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১১

১১. মুহম্মদ এনামুল হক, 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক রূপ', *মাহে নও*, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৫৬, পৃ. ২১

১২. রীনা দত্ত, 'ভাটিয়ালি গান', সনৎকুমার মিত্র সম্পা, *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, ভাটিয়ালী বিশেষ সংখ্যা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৭৩

১৩. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা গানের কথা, চট্টগ্রাম, ১৩৯৫, পৃ. ৩৭

১৪. জসীমউদ্‌দীন, *মুর্শীদা গান*, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ. ১

১৫. মুহম্মদ এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৬. আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫

১৭. জসীমউদ্‌দীন, *মুর্শীদা গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

১৮. আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১৯. রামশঙ্কর চৌধুরী, *লোকসংগীত প্রসঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৩৮

২০. আশুতোষ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬৬

২১. আবুল হাসান চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

২২. জসীমউদ্‌দীন, *মুর্শীদা গান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২-৩
২৩. ঐ, পৃ. ৪
২৪. ঐ, 'মুখবন্ধ', অংশের শুরুতে, পৃষ্ঠা সংখ্যা মুদ্রিত নেই
২৫. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৪
২৬. জসীমউদ্‌দীন, *স্মৃতির পট*, ঢাকা, পঞ্চম সং, ২০০০, পৃ. ১৫১
২৭. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯
২৮. ঐ, পৃ. ১৩৯
২৯. জসীমউদ্‌দীন, *রঙিলা নায়ের মাঝি*, ঢাকা, ১০ম সং, পৃ. ২১-২২
৩০. *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আহমদ শরীফ সম্পা., ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৩২
৩১. ঐ, পৃ.১৭০
৩২. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬
৩৩. ঐ, পৃ. ১৪৪
৩৪. জসীমউদ্‌দীন, *রঙিলা নায়ের মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
৩৫. ঐ, পৃ. ২৪
৩৬. ঐ, পৃ. ২৭
৩৭. জসীমউদ্‌দীন, *পদ্মাপার*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৮
৩৮. ঐ, পৃ. ৪৫
৩৯. ঐ, পৃ. ৪৫-৪৬
৪০. জসীমউদ্‌দীন, *রঙিলা নায়ের মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
৪১. ঐ, পৃ. ২৫
৪২. ঐ, পৃ. ৩০
৪৩. জসীমউদ্‌দীন, *পদ্মাপার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
৪৪. *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩
৪৫. জসীমউদ্‌দীন, *পদ্মাপার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩
৪৬. *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৪৭. জসীমউদ্‌দীন, *রঙিলা নায়ের মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৪৮. জসীমউদ্‌দীন, *রাখালী*, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১২
৪৯. ঐ, পৃ. ৪০

৫০. জসীমউদ্‌দীন, *রঙিলা নায়ের মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৫১. *মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
৫২. জসীমউদ্‌দীন, *রঙিলা নায়ের মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
৫৩. ঐ, পৃ. ৪৭
৫৪. জসীমউদ্‌দীন, *পদ্মাপার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
৫৫. জসীমউদ্‌দীন, *রঙিলা নায়ের মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪
৫৬. জসীমউদ্‌দীন, *রাখালী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
৫৭. জসীমউদ্‌দীন, *রঙিলা নায়ের মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৫৮. ঐ, পৃ. ১৮
৫৯. ঐ, পৃ. ৪৯
৬০. জসীমউদ্‌দীন, *পদ্মাপার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
৬১. ঐ, পৃ. ৫১
৬২. ঐ, পৃ. ৫২
৬৩. ঐ, পৃ. ৬৩
৬৪. কাজী নাসির, *উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া ও বিয়ের গীত সংগ্রহ ও স্বরলিপি*, ঢাকা, পৃ. ২
৬৫. জসীমউদ্‌দীন, *রঙিলা নায়ের মাঝি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
৬৬. ঐ, পৃ. ৫২
৬৭. জসীমউদ্‌দীন, *পদ্মাপার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮
৬৮. ঐ, পৃ. ৩৩